গুণীজন

আমাদের প্রেরণার উৎস

www.gunijan.org.bd

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৫ www.gunijan.org.bd

সম্পাদকীয়

'গুণীজন' ২০০৩ সাল থেকে দেশের গুণী ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য ওয়েবসাইট (www.gunijan.org.bd), ভুল কর্মসূচি, সিডি প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। নতুন প্রজন্ম তাদের দেশের সেরা সন্তানদের চিনে নিতে শিখবে—এটাও গুণীজন ট্রাস্টের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, তাঁদের অবদান, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্রের সমন্বয় করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখন অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেটাও কাজে লাগানো হচ্ছে। গুণীজন ট্রাস্টের আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে 'গুণীজন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের সংখ্যায় নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, সেলিনা হোসেন ও হুমায়ুন আজাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ জীবনী পড়ার জন্য ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সব ধরনের সহযোগিতার জন্য ভিনেটকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এই প্রয়াস স্বার্থক হয়ে উঠবে তখনই, যখন তরুণ প্রজন্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তাতে তাদের নিজেদের চলার পথ নির্ধারণ করা সহজ হয়ে উঠবে।

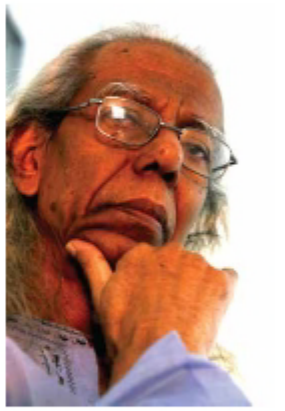

মহাদেব সাহা

গ্রামের এক বালিকা বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর পড়াশুনা। যদিও নামে সেটি ছিল বালিকা বিদ্যালয় কিন্তু সেখানে ছেলে-মেয়ে সকলেই এক সাথে পড়াশুনা করত। এখান থেকে প্রাইমারি ধাপটি পাশ করে ভর্তি হন গ্রামেরই উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরে চলে আসেন বগুড়ার ধুনট উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে বন্ধুদের সাথে মিলে বের করতেন দেয়াল পত্রিকা। এই বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ছিল প্রচুর বই। এসব বইয়ের মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে তোলেন পাঠাভ্যাস। তখন থেকেই আলাদা করে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর জীবনানন্দ দাশের কবিতা। বাড়ির সকলের ও বন্ধুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অংকের খাতা ভরে তুলতেন কবিতা দিয়ে। বিদ্যালয় ছুটির পর বন্ধুরা যখন মাঠে খেলতে যেত, তিনি তখন ঘুরে বেড়াতেন নদীর তীরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে।

সকলের চোখের আড়ালে কবিতা দিয়ে অংকের খাতা ভরে তোলা এই ছেলেটিই হচ্ছেন আমাদের প্রধান প্রিয় কবিদের একজন। নাম মহাদেব সাহা। তাঁর হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা কবিতা। এই কবির কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে আমাদের চিরপরিচিত জীবনেরই ক্লেদ-যন্ত্রণা আর সুখের অনুসঙ্গগুলি। বাংলা কবিতার আবেগময় রূপটিকে মহাদেব সাহা সজীব ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব বৈচিত্র্য দিয়ে। যে কারণেই পাঠক বারবার ফিরে আসে তাঁর কবিতার কাছে দ্রোহ বা প্রকৃতি কিংবা ভালবাসার ছোঁয়া পেতে।

১৯৬০ সালে ধুনট হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে পড়া শেষ না করেই চলে যান বগুড়ায়। বগুড়াতে থাকাকালীন সময়েই সাহিত্য আর পত্র-পত্রিকার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ তৈরি হয় মহাদেব সাহার। বগুড়া 'বেনীপুর বুক হাউস' তখন শহরের সকল সাহিত্যমোদীদের ঠিকানা। এইসব সাহিত্যমোদীদের সাথে আড্ডা দেওয়ার পাশাপাশি চলত তাঁর পড়াশুনা। তিনি বগুড়া কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন এবং বাংলায় সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

বগুড়া কলেজে পড়ার সময় সব আধুনিক ও প্রগতিশীল তরুণরা মিলে বের করে ফেললেন লিটল ম্যাগাজিন 'বিপ্রতীক'। সেসময় 'বিপ্রতীক' ঢাকায়ও যথেষ্ট আলোড়ন তোলে। বেনীপুর বুক হাউসে তখন নতুন নতুন সব পত্রিকা আর বই যেত। একদিন মহাদেব সাহার হাতে পড়ে 'কণ্ঠস্বর' নামে একটি পত্রিকা। সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। 'কণ্ঠস্বর' তখন অন্যরকম এক পত্রিকা। এটি যেন চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায় তরুণ কবিতাপ্রেমীদের। অভিভূত হয়ে যান মহাদেব সাহা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬৮ সালে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৬৯ সালে ইংরেজি বিভাগে পুনরায় ভর্তি হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তখন সত্যিকার অর্থেই সাহিত্যের তীর্থভূমি। কবি ও সাহিত্যিক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সম্পাদনায় বের হয় 'পূর্বমেঘ' আর লোক গবেষক কবি ময়হারুল ইসলাম বের করেন 'উত্তর অন্বেষা'। রাজশাহী থেকে বের হয় আরও তিনটি সাহিত্য পত্রিকা 'সুনিকেত মল্লার', 'বনানী' ও 'একান্ত'। আর অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর, অধ্যাপক মশাররফ হোসেন, হাসান আজিজুল হক, গোলাম মুরশিদ, সনৎ কুমার সাহা, আবদুল হাফিজ, আলী আনোয়ার সবাই মিলে যেন শিল্প-সাহিত্যের এক রাজত্ব তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা লেখার কারণে সকলেরই স্নেহ পান মহাদেব সাহা। এমন পরিবেশে নিজেকে বুঁদ করে রাখেন কবিতা লেখায়। ঢাকার অনেক পত্রিকাতেই তখন নিয়মিত কবিতা ছাপা হচ্ছে তাঁর। রেডিওর গীতিকার বন্ধুদের উৎসাহে মহাদেব সাহাও গান লেখেন। সারাদিন ঘোরাঘুরি, রাতভর আড্ডা, তর্ক-বিতর্ক, শেষ রাতে হলে ফেরা। সব কিছুতেই নিজেকে লীন করে দেন মহাদেব সাহা। আবার গোপনে বুনে তোলেন নিজস্ব এক ঠিকানাও।

এতোকিছুর মধ্যেও যেন 'কণ্ঠস্বর' মোহবিষ্ট করে রাখে তাঁকে। সাহস করে একদিন সেখানে পাঠিয়ে দিলেন একটি কবিতা। অসম্ভব দ্রুততায় মহাদেব সাহার হলের ঠিকানায় একটি হলুদ খাম এসে হাজির। 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন, আগামী সংখ্যাতেই কবিতাটি ছাপা হচ্ছে। চিঠি পেয়ে সে কী আনন্দ আর উত্তেজনা।

পূর্ব বাংলায় তখন গোটা দেশ উত্তাল বিক্ষোভ-মিছিল-মিটিংয়ে। প্রায় প্রতিদিন টানটান উত্তেজনা। উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও। সময়টা '৬৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি। আর্মি, পুলিশ, ইপিআর ঘিরে ফেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেইট বন্ধ। অগ্নিশিখার মতো জ্বলজ্বলে সবার চোখ। ১৪৪ ধারা ভেঙে বেরিয়ে গেল ছাত্র-ছাত্রীরা। ড. জোহা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। তিনি এসেছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁচাতে। কিন্তু নিজেই বুক পেতে নিলেন ঘাতকের গুলি। মহাদেব সাহা তখন মাত্র কয়েক গজ দূরে। তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। শোকে পাথর হয়ে গেলেন তিনি।

'৬৯-র জুন মাসে 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ উদ্যোগ নেন তরুণ কবি-লেখকদের নিয়ে প্রথম সাহিত্য উৎসব করার। সম্মেলন হবে ঢাকায়। সভাপতি মুনীর চৌধুরী। সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পড়ার জন্য মহাদেব সাহাকে অনুরোধ করেন 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদক। একটু অবাকই হন মহাদেব সাহা। কারণ তখন একমাত্র মহাদেব সাহা ছাড়া ঘাটের লেখকেরা প্রায় সারাবেঁধে দাঁড়িয়ে গেছেন ততদিনে। অধ্যাপক আবদুল হাফিজও প্রবন্ধ পড়বেন সম্মেলনে। দুজনই সম্মেলনে যোগ দিতে এলেন ঢাকায়। এই আসাটাই যেন মহাদেব সাহাকে সত্যিকার অর্থে ঢাকা চিনিয়ে দিল। সম্মেলনে নতুন লেখকদের সঙ্গে পরিচয় যেমন হল, প্রবন্ধ পড়ে কিছু প্রশংসা আর মফস্বলী বলে কিছু বিদ্রুপ ও তীক্ষ্ণ অট্টহাসিও জুটল। কিন্তু এরই মধ্যে যা বোঝার বুঝে গেলেন মহাদেব সাহা। এখানে পাড়ি না জমালে যেন কবিতার বিকাশ নেই। এক অদ্ভ মোহ সারাক্ষণ লেগে থাকে তাঁর পিছু। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। ঢাকায়ই আসবেন। এদিকে রাজশাহীতে বাকি রইল গবেষণা আর শিক্ষা-দীক্ষার যত উপাচার।

ঢাকায় এসে ১৯৬৯-এর জুলাই মাসে দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এ সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন তিনি।

১৯৭৩ সালে ঢাকায় দেখা হয় কুমিল্লার মেয়ে নীলা সাহার সাথে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে দুজন বিয়ে করেন। তাঁদের দুই পুত্র সন্তান তীর্থ ও সৌধ।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে 'পূর্বদেশ' বন্ধ হয়ে যায়। টানা পাঁচ বছর বেকার। এরপর ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত কলাম লিখতেন 'সংবাদ'এ। সারথি নামে। প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহে দুটি করে পরে একটি করে সেই কলাম লেখার কাজ চালিয়ে যান। এসময় নানা অনিয়মে শরীরে জেঁকে বসে অসুস্থতা। যেন এক চরম দুঃসময়ের কাল। নানা ঘাটের পানি খেয়ে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আবার ১৯৮০ সালে চাকুরী হয় 'ইত্তেফাক'-এ। সে চাকুরী প্রায় ৩০ বছরের।

এখন সকল কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ সময় কাটাতেই বেশী পছন্দ করেন তিনি। এখন যার একমাত্র আশ্রয় পরমপ্রিয়া কবিতার কাছে।

তাঁর বাবা গদাধর সাহা বৃটিশ আমলে এন্ট্রাস পরীক্ষার সময় কলকাতায় গিয়ে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সাথে। লেখাপড়া আর বিশেষ এগোয়নি। মা বিরাজমোহিনী স্কুল পাশ করা গৃহিনী। বৃহত্তর পাবনা জেলার ধানগড়া গ্রামে ১৯৪৪ সালের ৫ আগস্ট মহাদেব সাহা জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান তিনি। সেই আমলেই তাঁর বাবা কলকাতা থেকে ডাকযোগে আনাতেন 'লোকসেবক', ইংরেজী অর্ধ সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার', মাসিক 'বসুমতি' ইত্যাদি পত্রিকা।

সাহিত্যের পালাবদলে বাংলা কবিতার শ্বাশত রূপটিকে মহাদেব সাহা স্বব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন তাঁর ৫৯টি কাব্যগ্রন্থে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কবিতার বই ছাড়াও লিখেছেন ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী, সমালোচনাসহ নানা ধরনের রচনা।

স্বাধীন বাংলার প্রসব বেদনায় তখন কাতর পূর্ব পাকিস্তান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, '৬৯-এর ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা এসবেই তখন বাংলা মগ্ন। মগ্ন কবিতাও। সিকান্দার আবু জাফরের 'সমকাল', আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের 'কণ্ঠস্বর', 'সংবাদের সাময়িকী' এসব আড্ডায় খুব অনায়াসেই ঢুকে গেলেন মহাদেব সাহা। নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন আজাদ, রফিক আজাদ বন্ধু হয়ে গেলেন। হাসান হাফিজুর রহমান, আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ- এদেরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন মহাদেব সাহা। বন্ধুদের অনেকের সাথে জীবনাচরণে পার্থক্য থাকলেও আদর্শের কারণে একে অপরের যেন হরিহর আত্মা। এর মধ্যেই আসে একাত্তরের কালো রাত্রি, ২৫ মার্চ। তখন থাকতেন আজিমপুরে একটি বাসায়। ২৬ মার্চ বেরিয়ে প্রত্যক্ষ করেন ঢাকা শহরের সমস্ত বর্বরতা। শহর জুড়ে তখন কারফিউ। ২৭ মার্চে ঢাকা থেকে চলে যান নিজের গ্রামের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে স্থানীয়ভাবে তরুণদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। পরে জুন মাসের দিকে আসাম হয়ে পরিবারসহ চলে যান কলকাতায়। সেখানে গিয়ে যুক্ত হন 'জয়বাংলা' পত্রিকা অফিসে, কাজ করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও। স্ক্রীপ্ট লেখা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি কাজ করেন কলকাতায়। যুগান্তর, আনন্দবাজারসহ নানা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন। বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করার কাজ করতেন সেসময় মহাদেব সাহা।

১৩ ডিসেম্বর সাতক্ষীরায় প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ে। ভারত থেকে কবি, সাংবাদিকদের একটি দল সেদিন সাতক্ষীরায় আসে সরেজমিন পরিদর্শনে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়দের দলে সেদিন মহাদেব সাহাও ছিলেন। স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম স্পর্শ আজও শিহরণের মতো মনে হয় কবি মহাদেব সাহার কাছে। একে মনে করেন জীবনের দুর্লভ অক্ষয় স্মৃতি।

১৯৭৫ সালে প্রবল হতে থাকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির হুঙ্কার। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। শুরু হয় স্বাধীন বাংলার পিছন দিকে হাঁটা। বাকস্বাধীনতা মানে বন্দুকের নল। দেশ ও জাতির গভীর ক্রান্তিকালে মহাদেব সাহার কবিতায় তখন উচ্চারিত হয় দ্রোহ আর প্রতিবাদ। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তখন কবিতা প্রকাশ করেন 'সংবাদ', 'সমকাল' সহ বিভিন্ন পত্রিকায়। বন্ধু, অভিভাবক আর আত্মীয়-স্বজনেরা এতো ঝুঁকি হতে মানা করেন তাঁকে। কিন্তু কে ঠেকিয়ে রাখে ঘৃণার উদগার। 'আরো একজন', 'আলস্য প্রহর', 'ভোরের প্রসঙ্গ', 'কফিন কাহিনী', 'দেশপ্রেম' প্রভৃতি কবিতায় সেই স্বাক্ষরই রয়েছে।

'৮০-র দশকে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন মহাদেব সাহা। ১৯৮৭ সালে জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন ও আন্দোলনেও পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। যুক্ত হন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সাথেও। কবিতার জন্য ১৯৮৩ সালে পুরস্কার পান বাংলা একাডেমীর। পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তখন তুলে দেন কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক মনস্কতা মহাদেব সাহাকে টেনে আনে মাটি আর মানুষের কাছাকাছি। চিলির প্রখ্যাত কবি পাবলো নেরুদার মতো যাঁর স্থির বিশ্বাস ও আস্থা, 'আমাদের কালে একজন কবির দায় থাকবে নির্জনতা এবং জনতা উভয়ের প্রতি।'

তথ্যসূত্র : মহাদেব সাহার নির্বাচিত কবিতা; আমার কণ্ঠস্বর- নির্মলেন্দু গুণ; ভালবাসার সাম্পান- আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ; সংবাদ সাময়িকী- ৭ আগষ্ট, ২০০৮; সাপ্তাহিক- ঈদ সংখ্যা, ২০০৮; মহাদেব সাহার সাক্ষাৎকার।

লেখক : চন্দন সাহা রায়

নির্মলেন্দু গুণ

কতই বা বয়স তখন তাঁর? ছয় বছর! বাবার কণ্ঠে রবি ঠাকুরের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার আবৃত্তি শুনে, কেঁদে বুক ভাসাতেন রাখালের জন্য। শুভ্র চুল দাড়ির এই শুভ্র বৃদ্ধকে বড় নিষ্ঠুর মনে হতো তাঁর। সমুদ্র দর্শনের আনন্দ দিয়ে রাখালকে মাসীর বুকে ফিরিয়ে দিলে কী ক্ষতি হতো? কেন এত দুঃখের ভেতর দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়া? এই কি কবির কাজ? বাবা বলতেন, এগুলো কল্পনা, সত্য নয় "Life is Mathematical, not poetry".
মা ছিলেন অষ্টগ্রামের দত্ত বংশীয়া। মনসামঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত ছিলেন দত্তদের পূর্ব পুরুষ। বাবা সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী ছিলেন চিত্রশিল্পী। কিন্তু কলকাতা আর্ট স্কুলের ছবি আঁকার পাঠ শেষ করতে না পারায় মনের অজান্তেই তিনি হয়ত চেয়েছিলেন- তাঁর ছেলেমেয়েদের কেউ একজন শিল্পী হোক। তাই হয়ত সচেতনভাবেই এক সন্তানের নামও রেখেছিলেন মহাকবি কালিদাসের নামে, যে মাত্র ৩ বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল। আর ছোট ছেলের মাঝে কবিতাগুণের প্রকাশ দেখে, শিল্পী হতে সহায়তা করে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার বিশাল আকাশ। যে আকাশকে ক্যানভাস করে তাঁর ছেলে আঁকবে কাব্যচিত্র। তাঁর সেই স্বাধীনতার আকাশ পাওয়া ছেলেটির নাম নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী। যে তাঁর ক্যানভাসকে রাঙিয়েছে নানা বর্ণের কাব্যচিত্রে। ৩ বোন ও ২ ভাইয়ের ছোট নির্মলেন্দু গুণ।

যে বয়সে মায়ের চেয়ে খেলাকেই বেশী ভালোবাসতে শুরু করে শিশুরা সেই বয়সেই মা বীনাপানিকে হারান নির্মলেন্দু গুণ। মাত্র ৪ বছর বয়সে। জন্ম ২১ জুন ১৯৪৫ বৃহস্পতিবারে। ময়মনসিংহের বারহাট্টার কাশবন গ্রামে। মা মারা যাবার পর তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন। লেখাপড়ার হাতেখড়ি নতুন মা চারুবালার হাতেই। ৩য় শ্রেণীতে প্রথম স্কুলে ভর্তি হন করোনেশন কৃষ্ণপ্রসাদ ইন্সটিটিউটে। ক্লাসে বসেই একদিন লিখে ফেলেন একটি ছড়া, স্কুলকে নিয়ে। শুরুটা এভাবেই। ক্লাস এইটে পড়ার সময় স্কুলে বাংলার নতুন শিক্ষক মুখলেসুর রহমান স্যার আসেন। তিনি খুব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর মাধ্যমেই এসময় মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের পর কবি জীবনানন্দের কবিতার সাথে প্রথম পরিচিত হন তিনি। এসময় বারহাট্টার বিখ্যাত রামমঙ্গল গায়েন ছিলেন নরেন্দ্র গায়েন। বিভিন্ন পার্বণে গেরুয়া রং-এর ধুতি, পাঞ্জাবী ও উত্তরীয় পরা নরেন্দ্র গায়েন যখন হারমোনিয়াম, খোল, করতাল বাদ্যসহকারে আবেগপূর্ণভাবে রামমঙ্গল পরিবেশন করতেন, তখন সেই কাব্য ও ছন্দের মাধুর্য তাঁকে নতুন জগতের সন্ধান দিত। কাব্য আর ছন্দের প্রেরণা সেখান থেকেও তিনি পেয়েছিলেন।

দুই বিষয়ে লেটারসহ মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পান ১৯৬২ সালে। মাত্র ৩ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিল স্কুল থেকে। বাবা তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন- 'কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম।'

মেট্রিক পরীক্ষার আগেই নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণের প্রথম কবিতা 'নতুন কান্ডারী'। এসময় এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী। মেট্রিকের পর আই.এস.সি. পড়তে চলে আসেন আনন্দমোহন কলেজে, ময়মনসিংহে। থাকেন হিন্দু হোস্টেলে। নতুন জীবনের স্বাদ এবার এখানে। স্বাধীনতা। যা খুঁজেছেন এতদিন। দেরীতে হোস্টেলে ফেরা শুরু হয় নিত্যদিন। ২য় বর্ষে উঠেই হোস্টেলের ম্যানেজার নির্বাচিত হন এবং বাজারের টাকা মারা ও জুয়া খেলার অপরাধে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ পান। সকলের বক্র দৃষ্টি তাঁকে কন্টকাকীর্ণ করে তোলে। আনন্দমোহনে আর আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাবার প্রস্তাবে টিসি নিয়ে চলে যান নেত্রকোণা কলেজে।

মেট্রিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের সুবাদে পাওয়া রেসিডেন্সিয়াল স্কলারশিপসহ পড়তে থাকেন এখানে। নেত্রকোণায় ফিরে এসে নির্মলেন্দু গুণ আবার 'উত্তর আকাশ' পত্রিকা ও তাঁর কবি বন্ধুদের কাছে আসার সুযোগ পান। নেত্রকোণার সুন্দর সাহিত্যিক পরিমন্ডলে তাঁর দিন ভালোই কাটতে থাকে। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে আই.এস.সি. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের ১১৯ জন প্রথম বিভাগ অর্জনকারীর মাঝে তিনিই একমাত্র নেত্রকোণা কলেজের।

সকলে খুশি। বাবা খুশি। এবার ছেলের সামনে উচ্চশিক্ষার সুগম পথ। ভালো ফলাফল তাঁর যাত্রাকে বেগবান করবে এমনটাই আশা। বাবা চাইতেন ডাক্তারী পড়া। কিন্তু না তিনি সুযোগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে। ভর্তির প্রস্তুতি নেন নির্মলেন্দু গুণ। হঠাৎ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয় ঢাকায়। দাঙ্গার কারণে তিনি ফিরে আসেন গ্রামে। ঢাকার অবস্থার উন্নতি হলে ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর নাম ভর্তি লিষ্ট থেকে লাল কালি দিয়ে কেটে দেওয়া। আর ভর্তি হওয়া হলো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিরে আসেন গ্রামে। আই.এস.সি.-তে ভালো রেজাল্ট করায় তিনি ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। মাসে ৪৫ টাকা, বছর শেষে আরও ২৫০ টাকা। তখনকার দিনে অনেক টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতে পারায় একবার ভেবেছিলেন পড়াশুনার ইতি টানবেন। কিন্তু ভালো রেজাল্টের সুবাদে পাওয়া ফার্ষ্ট গ্রেড স্কলারশিপ মিস্ না করতে আবার ফিরতে হয় সেই আনন্দমোহন কলেজে। যে কলেজটি আই.এস.সি. দ্বিতীয় বর্ষে তাঁকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখানে তিনি ভর্তি হন পাস কোর্সে বি.এস.সি.তে। যদিও এ পরীক্ষায় আর উত্তীর্ণ হওয়া হয়নি তাঁর। কিন্তু ১৯৬৯ সালে প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করেন তিনি (যদিও বি.এ. সার্টিফিকেটটি তিনি তোলেননি)।

১৯৬৫ সালে আবার বুয়েটে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডাক পড়ে ভাইভা বোর্ডে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো। আর বেশ কিছু হিন্দু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার চাকুরী ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিল বলে ভর্তিচ্ছুদের পারিবারিক অবস্থা জেনে নেবার চেষ্টা করতেন প্রশ্নকর্তারা। নির্মলেন্দু গুণ পরিষ্কার করেন যে, তাঁর এক ভাই ভারতে থাকলেও ইঞ্জিনিয়ার হলে তিনি দেশেই থাকবেন। কিন্তু ভাইভা বোর্ডে পাঠ্যসূচী থেকে কোন প্রশ্ন না করেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ততদিনে সাম্প্রদায়িকতার কালো শেকড় অনেক জায়গাতেই প্রথিত হয়েছে। একবুক কষ্ট নিয়ে ফিরে আসেন আনন্দমোহনে। তখন থেকেই হতাশাগ্রস্ত নির্মলেন্দু গুণ অফুরন্ত আনন্দের উৎসে অবগাহনে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। আই.এস.সি.তে পাওয়া বৃত্তির টাকা আর হতাশা তাঁকে নতুন যাত্রার পথে ঠেলে দেয়। তাঁর মাঝে ঘুমিয়ে থাকা আত্মপ্রকাশে উন্মুখ নেশাগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। নব আনন্দে ডালপালা মেলে দেয় তারা। অফুরন্ত আনন্দের তৃষ্ণা তাঁকে অস্থির করে তোলে। নিজের কাছে প্রশ্ন জাগে, আনন্দের চেয়ে বড় আরাধ্য, বড় প্রত্যাশা জীবনে আর কী হতে পারে? আনন্দ সমুদ্রে অবগাহনের চেয়ে মহৎ অর্থ আর কী আছে? মৃত্যুতে একদিন নিঃশেষ হতে হবেই, তবে কেন বিমূর্ত এক জীবন আনন্দের আশায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দকে অস্বীকার করে কষ্ট পাওয়া। চারপাশে যেখানে বিরাজমান অফুরন্ত আনন্দের অজস্র উপাদান। ধরণীর আনন্দ আবাহনে সাড়া দেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' শেষে জেগে ওঠেন নবীন উল্লাসে। মদ্য-পদ্য-সিদ্ধি-গণিকা-জুয়া এই পঞ্চভূতের পাদপদ্মে উৎসর্গ করেন নিজেকে। আর সেই সাথে চলে সর্বদা কাব্য চর্চার সঞ্জীবনী খুঁজে ফেরা। প্রকাশিত হয় কবিতা। ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ সালে ঢাকার 'সাপ্তাহিক জনতা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'কোন এক সংগ্রামীর দৃষ্টিতে'। নিজের সম্পাদনায় বের করেন 'সূর্য ফসল' সংকলন। কবি সিকান্দার আবু জাফর সংকলনের জন্য আশীর্বাণী লিখে দেন। ঐ সংকলনের কবিতার মাধ্যমে শোষক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষকে ডাক দেওয়া হয়। সংকলনের বিভিন্ন কবিতায় ফুটে ওঠে বিদ্রোহ যা শাসক শ্রেণীর পছন্দ হয় না। ফলস্বরূপ মামলা হয়। জারি হয় নির্মলেন্দু গুণের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা।

পরে অবশ্য প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা খুরশেদ চৌধুরী ও মৌলনা ফজলুর রহমান সাহেবের মধ্যস্থতায় মামলা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু এর পরই আসে অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাত। ডাকাতির মামলা হয় তাঁকে আসামী করে, আবার গ্রেফতারী পরোয়ানা। হুলিয়া। পলাতক জীবন। কখনও গৌরীপুর, শ্যামপুর, কখনও জারিয়া-ঝাঞ্জাইল। একসময় চলে আসেন ঢাকা। থাকতে শুরু করেন নাট্যকার বন্ধু মামুনুর রশীদের সাথে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট-এর হোস্টেলে। কাজ শুরু করেন আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদের 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকায়। এসময় কবি বন্ধু আবুল হাসান তাঁর সর্বক্ষণ সঙ্গী হয়ে ওঠেন। মাথার ওপর তখনও ঝুলছে হুলিয়া। যে কবিতার জন্য হুলিয়া মাথায় নিয়েছেন সে কবিতাকে আর সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। নির্মলেন্দু গুণ ঠিক করেন সাহিত্যের সাথেই সংযুক্ত থাকবেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। যদিও শিক্ষা খাতে অর্থ আর সময় ব্যয়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন এতদিনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব অর্জনের জন্য। এক সময় তুলে নেওয়া হয় মামলা। সর্বক্ষণ তাঁর ধ্যান জ্ঞানে কবিতা তখন ডালপালা মেলছে।

দেশ তখন অস্থির। ৬ দফা আন্দোলন তখন দানা বাঁধছে। তখন 'সংবাদ'-এ ছাপা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা কবিতা 'প্রচ্ছদের জন্য'। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহপাঠী হিসেবে পান মুজিব কন্যা শেখ হাসিনাকে।

১৯৬৭ সালে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ বাংলা কবিতার প্রধান কবিদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে রুশ কবি মিখাইল লুকোনিন ঢাকায় আসেন। লেখক সংঘের এক অনুষ্ঠানে লুকোনিন আবৃত্তি করেন নিজ কবিতা "Sleep O Sleep" এবং "The Charcoal Frontier" কবিতার অংশবিশেষ। তিনি মুগ্ধ হন এবং লুকোনিনের সাহিত্য ও দর্শনে আকৃষ্ট হন। সমাজ বাস্তবতাবাদী মার্কসীয় সাহিত্য দর্শনের প্রতি আস্থা সৃষ্টিতে এ রুশ কবির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। ঢাকা শহরে নির্মলেন্দু গুণের নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা ছিল না। কবিতা লিখতেন, ঘুরে বেড়াতেন, আড্ডা দিতেন, প্রকাশকদের বইয়ের প্রুফ দেখতেন। আর টাকা পেলে নিয়মিত যেতেন ঠাঁঠারিবাজারের হাক্কার জুয়ার আড্ডায়। ১৯৬৮ সালের ২৯ জুলাই হোটেল পূর্বাণীতে তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের আসরে সুযোগ পান। পত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার পায় এ কবিতা পাঠের আসর। এ সুযোগ তাঁকে পাঠক ও কবি মহলে পরিচিতি দেয়।

এ বছরের প্রথম দিকে ছোট বোন সোনালী মাইগ্রেশন করে ভারতে চলে যায়। বোনকে সীমান্তে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়ে দেশে হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্য ও ফলশ্রুতিতে দেশত্যাগের ঘটনা তাঁর অন্তরাত্মাকে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন করে। দেশত্যাগের সময় হিন্দুদের নাড়ি ছেঁড়ার বেদনায় দ্রবীভূত হয় তাঁর মন। এসময় তিনি অন্য অনেক সচেতন ছাত্র জনতার মত আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মেতে ওঠেন।

'৬৯-এর প্রথম দিকে রেডিওতে কবিতা পাঠের আসরে ডাক পান নির্মলেন্দু গুণ। ঢাকায় তাঁর প্রচুর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি লিখতেন 'সংবাদ', 'আজাদ', 'পাক জমহুরিয়াত', 'জোনাকী' প্রভৃতিতে। প্রকাশিত হয় তাঁর কলাম 'ফসল বিনাশী হাওয়া'। ২১ জুলাই ১৯৭০। তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের আসরে পাঠ করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'হুলিয়া'। 'হুলিয়া' তাঁকে কবি খ্যাতি এনে দেয়। বড় বড় লেখকরা তাঁর কবিতার প্রশংসা করেন। সমালোচনা লেখেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী 'তৃতীয় মত' কলামে। খান ব্রাদার্স বের করে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। পশ্চিমবঙ্গের শক্তিমান লেখক শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে ছাপেন 'হুলিয়া' কবিতাটি। এরপর আর থেমে থাকার সময় কোথায়? প্রেম ও গণমানুষকে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুকে পরিণত করে একে একে লিখে চলেন কবিতা- 'অমীমাংসিত রমণী', 'চৈত্রের ভালোবাসা', 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র'সহ আরও অনেক কবিতার বই।

স্বাধীনতার পূর্বপর্যন্ত চাকুরী করেছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর', আহমদ রফিক সম্পাদিত 'নাগরিক', 'পরিক্রম' ও 'জোনাকী' পত্রিকায়। এরপর আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা 'পিপলস'-এ কাজ নেন সাব এডিটর হিসেবে। স্বাধীনতার পর কাজ করেছেন আল মাহমুদ সম্পাদিত 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে। এরপর সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন 'সংবাদ' ও 'দৈনিক বাংলার বাণী'-তে। এরপর 'বাংলাবাজার' পত্রিকায় সাহিত্য ও সহকারী সম্পাদক। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন 'দৈনিক আজকের আওয়াজ' নামে একটি পত্রিকায় যেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি আর কোথাও চাকুরী করেননি। তিনি তাঁর লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত জীবন কাটাচ্ছেন।

মহান ১৯৭১। যুদ্ধকালীন কলকাতাস্থ আকাশবাণী ভবনে 'বেতার জগত' পত্রিকার সম্পাদক ডা. গাঙ্গুলীর সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নির্মলেন্দু গুণ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কবিতাকে অস্ত্রে পরিণত করেন। তাঁর নিজের ভাষায় "কবিতা আমার নেশা, পেশা, প্রতিশোধ গ্রহণের হিরন্ময় হাতিয়ার।" তাঁর কবিতার মাঝে ছিল দেশপ্রেম, সংগ্রাম, রাজনীতি। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সমাজ জীবনের উজ্জীবন ও সাধারণ জীবনযাত্রাকে ধরতে সক্ষম ছিল তাঁর কবিতার ফ্রেম।

মূলত গদ্যকবিতা রচনা করলেও ছন্দ নিয়ে খেলা করেছেন নির্মলেন্দু গুণ। কোন কোন সমালোচক তাঁর ছন্দ কবিতায় ছন্দ-শৈথিল্যের কারণে ছন্দ লিখতে প্রায়ই হোঁচট খাবার অভিযোগ করেন। তবে তিনি বিশুদ্ধ ছন্দ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রেও সমালোচকের মন্তব্য, "খড়ে দুয়েকটি বক মরেছে।" নির্মলেন্দু গুণ এক কন্যাসন্তানের জনক। তাঁর মেয়ের নাম মৃত্তিকা।

নির্মলেন্দু গুণ সাহিত্য সাধনার জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কবি আহসান হাবীব সাহিত্য পুরস্কার। তিনি নিজ গ্রাম কাশতলায় প্রতিষ্ঠা করেন 'কাশবন বিদ্যা নিকেতন' নামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

এক সময় ভাবতেন বড় হয়ে সন্ন্যাসী হবেন। তাঁর জ্যাঠামশাই সন্ন্যাস ব্রত নিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই কেন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন খুব জানার ইচ্ছে ছিল তাঁর। তবে তিনি তা জানতে পারেননি। কিন্তু কাব্যকে আশ্রয় করে তিনিও তো সন্ন্যাসী হয়েছেন। কবিতার প্রেরণায় ছুটেছেন পথ থেকে পথে। কবিতার ভাষায় হয়ে উঠেছেন ক্ষমতাধর। আর পরম ক্ষমতার প্রতি তাঁর নিজ সঙ্গায়িত ভক্তি রেখে ছুটেছেন বাক্যের পথে প্রান্তরে। লিখতে পেরেছেন 'ধাবমান হরিণের দ্যুতি' বা 'অগ্নি সঙ্গমের' মত চিন্তার খোরাক জোগানো কাব্য। প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের কাব্য দর্শন। শ্বেত শুভ্র চুল দাড়ির এ কাব্য অন্বেষক, কাব্য দার্শনিকও তো বটে।

তথ্যসূত্র : আমার ছেলেবেলা-নির্মলেন্দু গুণ; আমার কণ্ঠস্বর-নির্মলেন্দু গুণ; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : লেখক।

লেখক : রাজিত আলম পুলক

সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন একই সাথে কথাসাহিত্যিক, গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশকে তিনি শুধু কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, শাণিত ও শক্তিশালী গদ্যের নির্মাণে প্রবন্ধের আকারেও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুনমাত্রা যোগ করেছে।

সেলিনা হোসেনের পৈতৃক নিবাস বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার হাজীরপাড়া গ্রামে। । বাবা এ কে মোশাররফ হোসেন ছিলেন রাজশাহী রেশম শিল্প কারখানার পরিচালক। মা মরিয়মন্নেসা বকুল ছিলেন গৃহিণী। তিনি খুব ভালো রান্না করতেন। ছেলেমেয়েরা কে কোথায় পড়াশুনা করবে তার সিদ্ধান্তও নিজেই নিতেন। অবসর সময়ে রেডিওতে খেয়াল শুনতেন, বাগান করতেন আর ফুলপাখি ভালোবাসতেন।

সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহী শহরে। সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ।

বাবার কর্মস্থল বগুড়ায় তাঁর শৈশব কাটে। শৈশবে তিনি অবাধ স্বাধীনতা ও উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠেন। মাঠে ঘাটে, প্রান্তরে, নদীতে, ঘুরে বেড়ানো, গাছ বাওয়া, কখনও অনেক উঁচু গাছে চড়ে বাবাকে দেখে বকা খাওয়ার ভয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাওয়া, ভাইবোন এবং অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে হল্লা করতে করতে স্কুলে যাওয়া ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজের একটি। স্কুল থেকে ফেরার পথে টিলায় উঠে পুলিশদের বন্দুকের গুলি থেকে বেরিয়ে আসা সীসা কুড়িয়ে হানিফের দোকান থেকে মুড়ি- মুড়কি, খুব ছোট ছোট রঙিন লজেন্স নিয়ে চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফেরার মধ্যে পেতেন এক অনাবিল আনন্দ। বাড়ি ফিরে পেটপুরে ভাত খেয়ে ছুটতেন মাঠের দিকে। গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, ছি-বুড়ি ইত্যাদি একেকরকম খেলা খেলতেন একেকদিন। সন্ধ্যা নামলেই ঘরে ফিরে হারিকেনের আলোয় পড়তে বসতেন।

তাঁর বাবা ছিলেন ভীষণ রাগী। ফলে বাবাকে ভাইবোনেরা খুব ভয় পেতেন। চার-পাঁচ বছর বয়সের ছোট বোন লাকির নেফ্রাইটিসে মৃত্যু তাঁর বাবাকে একদম বদলে দেয়। আর কোনোদিন কোনো ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তোলেননি তিনি।

পঞ্চাশ দশকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় বগুড়ার লতিফপুর প্রাইমারি স্কুলে।

সেসময়ে কাগজ কলমে লেখার রেওয়াজ না থাকায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি স্লেটে লিখতেন। স্লেটে শিক্ষক তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন লিখতে দিতেন এবং সেগুলো ঠিক হলো কিনা একজন আরেকজনকে যাচাই করতে দিতেন। একবার শিক্ষক একজনের স্লেট অন্যজনকে শুদ্ধ করতে দেন। তাঁর কাছে যার স্লেটটি পড়ে তিনি তার স্লেটে সঠিক উত্তরের জায়গায় টিক মার্ক এবং ভুল উত্তরের জায়গায় ক্রস চিহ্ন দেন। কিন্তু তাঁর স্লেটটি যে ছেলেটির হাতে পড়ে সে দুষ্টুমি করে সঠিক বানান হিজিবিজি করে কেটে দিয়ে স্লেটটি স্যারকে দেখায়। ফলে বোঝাই গেল না স্লেটে কী লেখা ছিল। এটা দেখে তিনি রাগে দুঃখে ভীষণ কাঁদেন। কিন্তু সাহস করে স্যারকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ছেলেটি তার যেসব বানান কেটেছে সেগুলো মুছে তিনি আবার লিখে দিবেন। স্যারের অনুমতি মিলল। তিনি বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখে স্যারকে দেখান। স্যার তো ছেলেটির কুটবুদ্ধি দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে দু'ঘা লাগিয়ে দেন। পাশ থেকে অন্য সহপাঠীরা এ নিয়ে তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলল, 'দেখতে পুঁচকে হলে কী হবে, সাহস আছে।' তিনি তাদের কথা গায়ে মাখলেন না বরং না শোনার ভান করে এড়িয়ে গেলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি বগুড়ায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাবার বদলির চাকুরীর কারণে এরপর তাঁরা রাজশাহীতে চলে আসেন। এখানে এসে রাজশাহীর পি এন গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর রাজশাহী মহিলা কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন এই কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী।

তাঁর লেখালেখির শুরু '৬৪ বা '৬৫ সালের দিকে। রাজশাহী কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১৯৬৪ সালে রাজশাহী আন্তবিভাগীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তিনি এই প্রতিযোগিতায় গল্প লিখে প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ানশিপ গোল্ড মেডেল পান। বিষয়গুলো ছিল বাংলা ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, ছোট গল্প লেখা, ইংরেজীতে নির্ধারিত বক্তৃতা। এ বছরই রাজশাহী মহিলা কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। তাঁরা সেলিনা হোসেনকে 'মেহেরজান'-এর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত করেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের প্রথম অভিনয়। মঞ্চে চরিত্রের মাঝে মিশে চমৎকার অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

সেলিনা হোসেন রাজশাহী মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে আই.এ. পাশ করে ঐ কলেজেই অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁদের নিয়েই কলেজটি অনার্স খোলার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু একবছর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় তিনি আর তাঁর সহপাঠী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মাযহারুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। অধ্যক্ষ তাঁদের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি করতে অপারগতা প্রকাশ করে প্রথম বর্ষে ভর্তি হবার পরামর্শ দেন। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে একথা ভেবে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তাই তাঁরা দুজনে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসউল হকের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের সমস্যার কথা জানান। উপাচার্য তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এর কয়েকদিন পর বাংলা বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানেন তাঁরা দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হতে পারবেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ঢাকার 'পূবালী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। ড. মাযহারুল ইসলাম, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সম্পাদনায় 'উত্তর অন্বেষা', 'পূর্বমেঘ' এবং ঢাকার 'মাহে নও', 'পূবালী' পত্রিকাতে তাঁর লেখা ছাপা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে তিনি রাজনীতিতে অংশ নেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়নে (মতিয়া গ্রুপে) যোগ দেন। দলের পক্ষে সভা-মিছিলে অংশ নেন। তিনি ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করাসহ নাটকে অভিনয় করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় চারবার চ্যাম্পিয়ন হন।

সেলিনা হোসেনের কর্মজীবন শুরু হয় বাংলা একাডেমীর গবেষণা সহকারী হিসেবে, ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে। তিনি ১৯৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকুরী পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকাতে উপসম্পাদকীয়তে নিয়মিত লিখতেন।

১৯৭০ সালে দুটো চাকুরীর ইন্টারভিউয়ের জন্য চিঠি পান। একটি বাংলা একাডেমিতে অন্যটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে সরকারী কলেজের জন্য। বাংলা একাডেমীর চাকুরীর ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক কবীর চৌধুরী, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন প্রমুখ। এর পাশাপাশি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সরকারি কলেজের চাকুরীর জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বোর্ডে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে পান। এম.এ. পাশ করার পরে তাঁর শিক্ষক আব্দুল হাফিজ তাঁকে বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে লেখা প্রকাশিত গল্পগুলো নিয়ে একটি বই করতে। যে বইটি তাঁর বায়োডাটাকে খানিকটুকু সমৃদ্ধ করবে। সে সময়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ঢাকা টেলিভিশনে বই বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান করতেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি সেলিনা হোসেনের প্রথম গল্পগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ইন্টারভিউ বোর্ডে মুনীর চৌধুরী সেলিনাকে বলেন, 'গল্পগুলো তো ভালোই লিখেছ।'

কলেজের চাকুরীটাও তাঁর হয়। তাঁকে পোস্টিং দেওয়া হয় সিলেটের এম সি কলেজে। সে সময়ে তাঁর ছোট মেয়ে লারার বয়স দুমাস থাকায় তিনি কলেজের চাকুরীটি গ্রহণ না করে সরকারি কলেজের থেকে অর্ধেক বেতনে বাংলা একাডেমীর চাকুরীটিতে যোগদান করেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি বাংলা একাডেমীর 'অভিধান প্রকল্প', 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ প্রকল্প', 'বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ', 'লেখক অভিধান', 'চরিতাভিধান' এবং 'একশত এক সিরিজের' গ্রন্থগুলো প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০ বছরেরও বেশি সময় 'ধান শালিকের দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমীর প্রথম মহিলা পরিচালক হন। ২০০৪ সালের ১৪ জুন চাকুরী থেকে অবসর নেন।

১৯৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারী সেলিনা হোসেন বিয়ে করেন। তাঁদের দুই কন্যা সন্তান-সাজিনা মুনা এবং ফারিয়া লারা। ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তাঁর স্বামী মারা যান। ১৯৭৩ সালে আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পুত্র সাকিব আনোয়ারের জন্ম ১৯৭৭ সালে।

ষাটের দশকের মধ্যভাগে রাজশাহী মহিলা কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর লেখালেখির সূচনা। সেই সময়ের লেখা নিয়ে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। তাঁর দুটি গ্রন্থ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' এবং 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। তাঁর কয়েকটি গল্প নিয়ে নাটকও নির্মাণ করা হয়েছে।

তিনি বর্তমানে ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক। তিনি 'জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরামে'র আহ্বায়ক। এছাড়াও তিনি গণ সাহায্য সংস্থা, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ বাংলাদেশ, ব্রতী, ইউ এস সি কানাডা-বাংলাদেশ, প্রিপ ট্রাষ্ট ইত্যাদি সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত।

তিনি ১৯৬৯ সালে প্রবন্ধের জন্য পান ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক, ১৯৮০ সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮১ সালে 'মগ্নচৈতন্যে শিস' উপন্যাসের জন্য আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮২ সালে অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসের জন্য কমর মুশতারী পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে 'অনন্যা' ও 'অলক্ত' পুরস্কার পান। এছাড়া ১৯৯৪-৯৫ সালে তিনি তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' রচনার জন্য ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ পান। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কানাড়ি, রুশ, মালে, মালয়ালাম, ফরাসি, জাপানি, ফিনিস, কোরিয়ান প্রভৃতি ভাষার তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'যাপিত জীবন' এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাস পাঠ্যসূচিভুক্ত। শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি উপন্যাস এম.ফিল. গবেষণাভুক্ত। ২০০৫ সাল থেকে শিকাগোর ওকটন কলেজের সাহিত্য বিভাগ দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য কোর্সে তাঁর 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়। ২০১০ সালে একুশে পদক পান সেলিনা হোসেনের । ঐ বছরেই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দেন ।

সেলিনা হোসেনের সৃষ্টি :
কথাসাহিত্য : 'জলোচ্ছ্বাস', 'জলবতী মেঘের বাতাস', 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড', 'মগ্ন চৈতন্যে শিস', 'যাপিত জীবন', 'নীল ময়ূরের যৌবন', 'ক্ষরণ', 'কাটাতারে প্রজাপতি', 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি', 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'যুদ্ধ', 'লারা', 'কাঠ কয়লার ছবি', 'মোহিনীর বিয়ে', 'আণবিক আঁধার', 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', 'মর্গের নীল পাখি', 'উৎস থেকে নিরন্তর' 'জলবতী মেঘের বাতাস', 'পদশব্দ', 'খোল করতাল', 'পরজন্ম', 'খুন ও ভালোবাসা', 'ভালোবাসা প্রীতিলতা', 'নির্বাচিত গল্প', 'মতিজ্ঞানের মেয়েরা', 'দীপান্বিতা' এবং 'একটি উপন্যাসের সন্ধানে', 'মানুষটি', 'গল্প সমগ্র', 'ঋতু বসন্তের ফুলকলি' ইত্যাদি ।

গবেষণা ও প্রবন্ধ নিবন্ধ : 'স্বদেশ পরবাসী', 'একাত্তরের ঢাকা', 'নির্ভয় করো হে', 'সংস্কৃতি ও শিশু', 'বাংলাদেশের মেয়ে শিশু', 'মুক্ত করো ভয়', 'দূরের দেশ কাছের দেশ'।

কিশোর সাহিত্য : 'সাগর', 'গল্পে বর্ণমালা', 'কাকতা-ভুয়া', 'অন্যরকম যাওয়া', 'আকাশপরী', 'জ্যোৎস্নার রঙে আঁকা ছবি', 'যখন বৃষ্টি নামে', 'বর্ণমালার গল্প', 'মেয়রের গাড়ি', 'গল্পটা শেষ হয় না', 'কিশোর সমগ্র', 'বায়ান্নো থেকে একাত্তর'।

সম্পাদনা : 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' বইটি ২০০৫ সালে প্রকাশ করেছে সাহিত্য বিলাস। 'জেন্ডার বিশ্বকোষ' একটি সম্পাদনা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নারী সম্পর্কিত অসংখ্য তথ্য সংকলিত করে তা পাঠকের সামনে সহজ-সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। বিশ্বখ্যাত এহরাক ইবসেককে নিয়ে দুটো বই সম্পাদনা করেছেন। যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন 'দক্ষিণ এশিয়ার নারীবাদী গল্প।'

তথ্য সূত্র
১. সাক্ষাৎকার : সেলিনা হোসেন (তারিখ : ২৮.০২.২০০৬, ২২.০৩.২০০৬, ১১.০৪.২০০৬)।
২. জেন্ডার বিশ্বকোষ : সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, প্রকাশক: মাওলা ব্রাদার্স, ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।
৩. মুক্ত করো ভয় : সেলিনা হোসেন, প্রকাশক: অনুপম প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

লেখক : রীতা ভৌমিক

হুমায়ুন আজাদ

১৯৮৪ সাল। তখন হুমায়ুন আজাদের বয়স মাত্র ৩৭ বছর। এই বয়সেই তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাংলা ভাষা'-এর প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে। একদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তাঁর নিজ রুমে বসে আছেন। এমন সময় রুমে প্রবেশ করেন বিশ্বভারতীর এক প্রবীণ অধ্যাপক, প্রাজ্ঞজন তিনি। অধ্যাপক সাহেব, হুমায়ুন আজাদের চেয়ে বয়সে কম করে হলেও চল্লিশ বছরের বড় হবেন। তিনি রুমে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ডক্টর হুমায়ুন আজাদকে কোথায় পাবো বলতে পারেন?' হুমায়ুন আজাদ বললেন, 'আমিই হুমায়ুন আজাদ।' বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বলেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না। যিনি বাংলা ভাষা সম্পাদনা করেছেন তাঁর বয়স এতো কম হতে পারে না।' হুমায়ুন আজাদ বলেন, 'কতো হওয়া উচিত?' অধ্যাপক বলেন, 'অন্তত পঁচাত্তর, এর আগে এমন জ্ঞান হতে পারে না।'

এই বই যখন প্রকাশিত হলো তখন বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বইটি তাঁর মাথায় তুলে নিয়ে হুমায়ুন আজাদকে বলেছিলেন, 'আপনাকে কেউ স্বীকৃতি দেবে না, তবে এ কাজের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে অনারারি ডিলিট ডিগ্রি দিলাম।' হুমায়ুন আজাদ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মানুষের এমন প্রশংসা খুব বেশি পাননি। তাই এগুলো তাঁর বুকে ফুলের মত বিঁধেছিল।

ড. হুমায়ুন আজাদ ছিলেন স্বঘোষিত নাস্তিক। তিনি আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সমস্ত প্রথাকে। নিজে হয়ে উঠেছিলেন প্রথাবিরোধী। তাঁর সমস্ত বই, প্রবন্ধ, কবিতা সৃষ্টি হয়েছে প্রথাকে অস্বীকার করে। তাঁর প্রবচনগুচ্ছ এদেশের পাঠক সমাজকে করে তুলেছে সচেতন, অপরদিকে ভক্তদের করে তুলেছে ক্রুদ্ধ। আর এ কারণেই তিনি হয়ে ওঠেছিলেন এদেশের কান্ট। হুমায়ুন আজাদের লেখালেখির পুরোটাই ছিল বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী। তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের মুখপত্র। তবে তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে কখনো ঢেকে রাখেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এবং তিনি তা অনেকবারই উল্লেখ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেই তিনি মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজ গড়ার পক্ষে অনুকূল বলে মনে করতেন।

তিনি ভালবাসতেন বাঙালীকে। আবার সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছেন সেই বাঙালীকেই। এর সপক্ষে তাঁর জবাব ছিল, তিনি এই গোত্রের মানুষ, তাই এই জাতির কাছে তাঁর প্রত্যাশা অনেক বেশি। কিন্তু যখন দেখেন বাঙালী অনিবার্যভাবে পতনের পথকেই বেছে নিচ্ছে তখন তিনি তার সমালোচনা করেছেন। একটি পবিত্র বিশুদ্ধ বাংলাদেশ তিনি চেয়েছিলেন, যেখানে কোনো স্বাধীনতা বিরোধী থাকবে না। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ফতোয়া দেবে না। গণতান্ত্রিক, মুক্তচিন্তাযুক্ত, ব্যক্তির অধিকারপূর্ণ, বদ্ধ মতাদর্শহীন, সচ্ছল, সৃষ্টিশীল, ভবিষ্যৎমুখি, সৎ, সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র হুমায়ুন আজাদ চেয়েছিলেন। সেখানে কেউ প্রভু, কেউ দাস থাকবে না। সকলের সচ্ছলতার ব্যবস্থা থাকবে, সেখানে কোনো মতাদর্শ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্নকে তাড়া করে ফিরেছে এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। বারবার তাঁকে আহত করেছে নানাভাবে।

হুমায়ুন আজাদের জন্ম বাংলা ১৩৫৪ সালের ১৪ বৈশাখ, ইংরেজি ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল। বাবা আবদুর রাশেদ প্রথম জীবনে শিক্ষকতা ও পোস্টমাস্টারির চাকুরী করতেন পরে ব্যবসায়ী হন। মা জোবেদা খাতুন গৃহিনী। যে গ্রামে তাঁর বাস ছিল সেটি অনেক আগে থেকেই বিখ্যাত একটি গ্রাম ছিল। কারণ এখানে জন্মেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। গ্রামের নাম রাঢ়িখাল। মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে অবস্থিত এটি। যদিও হুমায়ুন আজাদের জন্ম তাঁর নানাবাড়ি কামারগাঁও কিন্তু রাঢ়িখালকে হুমায়ুন আজাদ মনে করতেন তাঁর জন্মগ্রাম। গ্রামটি পানির গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। কারণ গ্রামে অনেকগুলো পুকুর ছিল। যা বর্ষাকালে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। আর গ্রামটিকে সেই পানির ওপর ভাসতে থাকা কচুরিপানার মনে হতো।

হুমায়ুন আজাদের আসল নাম 'হুমায়ুন কবীর'। লেখার জন্য নাম বদল করে শপথপত্রের মাধ্যমে তা স্থায়ী করে নেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই ও দুই বোন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। পড়াশুনার শুরু নিজ গ্রামেই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর আর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েননি। সরাসরি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন স্যার জে. সি. বোস ইন্সটিটিউশন-এ। এটিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করতেন হুমায়ুন আজাদ। তাঁর বাবা ছিলেন একাধারে গ্রামের স্কুলের শিক্ষক এবং অন্যদিকে পোস্টমাস্টার। বাবা তাঁকে সব সময়ই বলতেন, পড়, পড়। সেই পড়াই হুমায়ুন আজাদের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সৃষ্টিশীল কোনো বিষয়ই তাঁর অপ্রিয় ছিল না।

হুমায়ুন আজাদ যে ঘরে পড়তেন তার সামনে ছিল একটা কদম ফুলের গাছ। প্রতি বর্ষায় ফুল ফুটে এটি রূপসী হয়ে উঠত। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ার সময় এই কদম গাছকে নিয়েই তিনি একটি উপন্যাস লেখা শুরু করেন। যার কোনো কাহিনী ছিল না। ছিল শুধু রূপের বর্ণনা। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রচণ্ড প্রকৃতিপ্রেমী। তিনি বিভিন্ন সময়ের প্রকৃতির স্বাদ উপভোগ করতে পারতেন। হুমায়ুন আজাদের নিজের কথায়, "শীতের শিশির, কুয়াশা, ঠান্ডা বাতাস, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ, বর্ষার প্লাবন, ঝড়ো মেঘ শরতের সোনা আর কার্তিকের কুয়াশা, ফাল্গুনের সবুজ পাতা আমার ভিতরে ঢুকে গেছে। আমার যেমন ভালো লাগতো বোশেখের রোদ তেমনি ভাল লাগতো মাঘের ঠান্ডা। আমাদের গ্রামে আমার বয়সের অন্যরা অনেকটা বড়ো হয়েছে অন্যভাবে, প্রকৃতির রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছে কি না জানি না, তারা থেকেছে ওরই মধ্যে নানা কাজে। আমার বিশেষ কোনো কাজ করতে হয়নি, আমি যেমন বই পড়েছি তেমনি চারপাশকে পড়েছি। তবে আমি লোকজ্ঞ হয়ে উঠিনি।"

সেই ছেলেবেলা থেকেই হুমায়ুন আজাদের আগ্রহের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ। চয়নিকা থেকে তখন অজস্র কবিতা মুখস্থ বলতেন। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় কবিতা লেখার শুরু। তবে প্রথম ছাপা হয়েছিল গদ্য। কচিকাঁচার আসরে। জে. সি. বোস ইন্সটিটিউশন থেকেই ১৯৬২ সালে এস.এস.সি. পাশ করেন হুমায়ুন আজাদ।

সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে তিনি একুশতম স্থান অধিকার করেছিলেন। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢাকা কলেজে ভর্তি হন বিজ্ঞান বিভাগে। সেখানেই পরিচয় প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের সাথে। সেখান থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তারপর ১৯৬৪ সালে পারিবারিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৬৯ সালে সেখান থেকেই বাংলায় আবারো প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। একই বছর তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ে।

তারপর ১৯৭০ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে প্রায় এগার মাস কাজ করেন। ১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর চলে আসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে। হুমায়ুন আজাদ ১৯৭৩ সালে কমনওয়েলথ বৃত্তি পেয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য চলে যান এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেসময় প্রায় তিন বছর তিনি সৃষ্টিশীল লেখালেখি থেকে দূরে ছিলেন। তবে অন্তরঙ্গ বন্ধু রবার্টের সাথে অনুবাদ করেন জীবনানন্দ দাশের কবিতা। ১৯৭৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে অর্জন করেন পিএইচ.ডি. ডিগ্রী। ১৯৭৭ সাল থেকে তিনি পুরোপুরিই লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৭৮ সালের ১লা নভেম্বর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে।

১৯৭৫ সালে হুমায়ুন আজাদ বিয়ে করেন তাঁর সহপাঠী লতিফা কহিনূরকে। টেলিফোনে। এই বছরই বের হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলৌকিক ইস্টিমার'। আজাদ-লতিফা দম্পতির দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বই ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। লেখা ছিল তাঁর আনন্দ। এই নিয়েই সারাটা দিন ব্যস্ত থাকতেন তিনি। তিনি ছিলেন খুব পরিশ্রমী। কখনও তিনি অবসর সময় কাটাননি। যার ফলে পাঠকদের জন্য প্রায় ৭০টির মতো বই রেখে গেছেন। তাঁর লিখিত সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ছিল সমান গুরুত্বের স্বীকৃতি।

প্রকাশিত গ্রন্থ-কবিতা - অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩), জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০), সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫), আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে (১৯৯০), হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৩), কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু (১৯৯৮), কাব্য সমগ্র (১৯৯৮)। এছাড়া তাঁর আরও কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।

উপন্যাস - ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪), সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে (১৯৯৫), মানুষ হিসাবে আমার অপরাধসমূহ (১৯৯৬), যাদুকরের মৃত্যু (১৯৯৬), শুভব্রত, তাঁর সম্পর্কিত সুসমাচার (১৯৯৭), রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮), কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ (১৯৯৯), নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু (২০০০), দশ হাজার এবং আরো একটি ধর্ষণ (২০০৩), উপন্যাস সমগ্র-২ (২০০১), পাক সার স্বপ্ন (২০০৪)। এছাড়া তাঁর আরও উপন্যাস রয়েছে।

সমালোচনাগ্রন্থ
রবীন্দ্রপ্রবন্ধ: রাষ্ট্র ও সমাজনীতি (১৯৭৩), শামসুর রাহমান:নিঃসঙ্গ শেরপা (১৯৮৩), শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৮), নারী (১৯৯২), প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নীচে (১৯৯২), জলপাই রঙের অন্ধকার (১৯৯২), আমার নতুন জীবন (২০০৫), অনুবাদ গ্রন্থ 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' (২০০১)। এছাড়া তাঁর আরও সমালোচনাগ্রন্থ রয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞান - বাংলা ভাষা- প্রথম খণ্ড (সম্পাদিত) (১৯৮৪), বাংলা ভাষা- দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পাদিত) (১৯৮৫), প্রনোমিলাইজেশান ইন বেঙ্গলি (১৯৮৩), বাংলা ভাষার শত্রু-মিত্র (১৯৮৩), বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪), তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৮৮), অর্থবিজ্ঞান (১৯৯৯)। এছাড়া তাঁর অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানও রয়েছে।

কিশোরসাহিত্য -লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না (১৯৮৫), আব্বুকে মনে পড়ে (১৯৮৯), বুক পকেটে জোনাকী পোকা (১৯৯৩), কতো নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী (১৯৮৭), আমাদের শহরে একদল দেবদূত (১৯৯৬), অন্ধকারে গন্ধরাজ (২০০৩)। এছাড়া তাঁর অন্যান্য কিশোর সাহিত্যও রয়েছে।

সম্পাদনা - আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৯৪), মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড: ১৯৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা (১৯৯৭)।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, শিশু সাহিত্যের জন্য অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার এবং ২০০৪ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার লাভ করেন।

হুমায়ুন আজাদ যে গ্রন্থটির জন্য পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হন তা হলো 'নারী'। 'নারী' হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি সমালোচিত হন, বিতর্কিত হন। নারী গ্রন্থটি উপভোগ করে পাঠকের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা। নারীবাদী ভাবনার এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষ্য। তিনিই প্রথম এ দেশে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের সংগঠিত রূপ পাঠকদের সামনে হাজির করেন। যদিও এই তত্ত্ব ইউরোপের কিন্তু তিনি তা এইদেশের প্রেক্ষাপটেই উপস্থাপন করেন অসাধারণ ভঙ্গিমায়। বইটির জন্য তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধদের প্রবল বিরোধীতার মুখোমুখি হন। সেসময়ের সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করে। যদিও পরে আদালতের রায়ে তা অবমুক্ত হয়। এরই অনুষঙ্গ হিসেবে হুমায়ুন আজাদ অনুবাদ করেন সিমন দ্য বেভোয়ারের 'দ্য সেকেন্ড সেক্স'- 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' নামে।

২০০৪ সালের বইমেলাতে বের হয় তাঁর উপন্যাস 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। তাঁর অন্য অনেক গ্রন্থের মতো এটিও সমালোচিত হয়। মৌলবাদীরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়। রাজপথ থেকে একসময় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংসদে। মৌলবাদীরা প্রকাশ্যে তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি এসবের কোনোকিছুকেই তোয়াক্কা করেননি। তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাস মতো লিখে গেছেন, কথা বলে গেছেন। প্রতিদিনের মতোই ছিল তাঁর দিনলিপি।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সাল। বাংলা একাডেমিতে বইমেলা চলছে। সন্ধ্যার পর বইমেলা থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিজের বাসায় যাবার পথে ঘাতকদের আক্রমণের শিকার হন তিনি। তাঁর পবিত্র রক্তে পিচ্ছিল হয়ে ওঠে টিএসসি চত্বর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ছাত্র-জনতার মিছিলে-মিছিলে। মুহূর্তের মধ্যেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। আহত হুমায়ুন আজাদ বেঁচে আছেন কি নেই তা নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয়। এই ঘটনা সরকারের টনক নড়িয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে সরকার সেসময় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠায়। তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁর পিছু ছাড়েনি।

২০০২ সালে তিনি বিশ্বখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর কাজ করার জন্য জার্মান সরকারের নিকট একটি বৃত্তির আবেদন করেছিলেন। হত্যাপ্রচেষ্টার ঘটনার কিছুদিন পরেই জার্মান সরকার তাঁকে সেই কাজ করার জন্য বৃত্তি প্রদান করেন। তিনি জার্মানির মিউনিখে চলে যান। সেখানেই ২০০৪ সালের ১২ আগস্ট আকস্মিকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন হুমায়ুন আজাদ। ২৭ আগস্ট তাঁর মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ওই দিনই জন্মস্থান বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামের পারিবারিক বসতবাটি প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কিশোর সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ চেয়েছিলেন সমাজের কূপমণ্ডূক মানুষগুলোকে বুদ্ধির বন্দিত্ব থেকে মুক্তির দিকনির্দেশনা দিতে। আর এ কারণেই চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

তথ্যসূত্র: লেখাটি তৈরির জন্য 'বাংলার সক্রেটিস: হুমায়ুন আজাদ', 'শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা' - হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ২০০৪: 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' - হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩: 'আঁধারের দ্বীপাবলি:হুমায়ুন আজাদ' সম্পাদনা-লতিফা কোহিনুর, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৭: 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইট এবং ড. হুমায়ুন আজাদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্যের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

লেখক: চন্দন সাহা রায়

**গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প .....
তাঁদের অবদান,
বিভিন্ন সময়ের ....**

দেশের গুণী ব্যক্তিদের
পূর্ণাঙ্গ জীবনী পড়ার জন্য
ওয়েবসাইটটি দেখুন।

www.gunijan.org.bd

সম্পাদক : ঊর্মি লোহানী, প্রকাশক : গুণীজন ট্রাস্ট, মুদ্রণ : পাথওয়ে, অলংকরণ : আবু এহসানুল কবির হিমেল, যোগাযোগ : ৪/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক - বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েব : www.gunijan.org.bd, ফোন : +৮৮০৯৬০৬০০৩৬৩৮, +৮৮০৯৬০৬০১৬২২৭